গণনাট্য আন্দোলন ও বিজন ভট্টাচার্যের নাটক

ড. রুবেল আনছার*

Abstract

People's Theatre Movement and Bijon Bhattacharya became almost synonymous in the beginning of the 40's. He tops the contemporary prominent playwrights who composed dramas from Marxist perspective. No where can be found the misery and different factors Bengali live in the backdrop of the Famine better than Bijon Bhattacharya's work. His first play was *Agun* (Fire 1943), through which IPTA started its journey. In the continuation of People's Theatre Movement, the most powerful and revolutionary drama of Bijon Bhattacharya is definitely *Nabanna* (New Harvest 1944). This unique piece records the struggling lives of common people from the beginning of the 2nd World War to the famine of the fifties; therefore becoming 'a document of social degeneration'. *Nabanna* totally reflecting the goals and ideals of People's Theatre Association, became the representative piece of the genre and made Bijon Bhattacharya the first high priest of that movement. In fact, the seed that was sown with *Nabanna* transforms into a mighty tree with the publication of *Debigarjan*. There is no space for individuals in People's Theatre Movement, the main spirit is communal. And the dramas of Bijon Bhattacharya perfectly tune in with this spirit. In a nut shell, the innovative turn that was brought in the history of Bangla dramatics and our cultural heritage, solely owes to Bijon Bhattacharya. This essay explores the role of his plays in People's Theatre Movement.

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও অবিস্মরণীয় ঘটনা 'গণনাট্য আন্দোলন'। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাট্যআন্দোলন একদিনে গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হতে থাকে তখন জমিদার শ্রেণির অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গঞ্জে গড়ে ওঠা সৌখিন নাট্যশালা তার পুরাতন গৌরব হারাতে থাকে। এই পালা বদলের হাওয়ায় বাংলা নাটকের আদি ও মধ্যপর্বের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রোমান্স প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে রচিত অসংখ্য নাটকের 'পুণ্যের জয়, পাপের ক্ষয়'-এই ভাববোধ দর্শকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হতে থাকে। অন্যদিকে নাটক ও নাট্যমঞ্চের ওপরে চলচ্চিত্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকলে বাংলার মঞ্চ-পরিবেশ অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে নাট্যামোদী একদল যুবক চল্লিশের দশক থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন একটা ভাবোন্মাদনা নিয়ে আসেন। এই ভাবোন্মাদনা ক্রমে আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে, যা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'গণনাট্য আন্দোলন' হিসেবে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, 'গতানুগতিক পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের আওতায় থেকেই তার সংস্কারের প্রচেষ্টায় এদেশে গণনাট্যের উদ্ভব নয়, তার উদ্ভব হয়েছে সমাজমানসের এক রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণে।'[১] এই আন্দোলন শুধু আমাদের নাট্যসাহিত্যের ওপরই প্রভাব বিস্তার

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

করেনি, বরং বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধে এনে দিয়েছে গণসচেতনতার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মন্দিরা রায় লিখেছেন :

> 'গণনাট্য আন্দোলন' শব্দটি একটি বিশেষ সময়ের সন্ধিক্ষণের দলিল। মঞ্চ-পরিবেশের গতানুগতিকতা যখন বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো– সেই মুমূর্ষু নাট্যঅঙ্গনে একরাশ তাজা বাতাসের সুগন্ধ নিয়ে এসেছিলো এই আন্দোলন। 'গণনাট্যে'র অর্থ শুধু জনতা বা গণের নাটক নয়, সেই সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক তথা নাট্যআন্দোলনও বটে।[২]

সমকালীন এই নাট্যআন্দোলন তাই ভারতবর্ষব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মীদের একই পতাকা তলে বেঁধে ফেলার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত আর সাম্যবাদী মতাদর্শের ক্রমবর্ধমান জয় যেমন এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এনে দিয়েছিল নতুন উদ্দীপনার বীজমন্ত্র, তেমনি বাংলা নাটকে দেব-দেবী, নবাব-বাদশা ও জমিদার শ্রেণির পরিবর্তে সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষেরও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। সমকালীন এ নাট্যআন্দোলনের ফলে নাটকের প্রথাগত একনায়কতন্ত্র ওঠে গিয়ে সাধারণ মানুষ তথা গণমানুষই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

চল্লিশের দশকের গোড়ায় বাংলার রাজনৈতিক জীবনে ঘন ঘন পট পরিবর্তন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগমনী অভিসম্পাত, ফ্যাসিজমের খবরদারি, মন্বন্তরের অভিঘাত, পৃথিবীব্যাপী মৃত্যু-ক্ষুধা, হাহাকার-আহাজারি, বেঁচে থাকার তাগিদে একমুঠো নোংরা খাবারের জন্য মানুষ আর কুকুরের মধ্যে লড়াই, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের অবক্ষয়, কালোবাজারি ও চোরাকারবারির নগ্ন ব্যাপ্তি, ভূমিহীন কৃষকের দুর্দশা, বেকার সমস্যার তীব্রতা ইত্যাদি অক্টোপাসের মতো বাঙালি সমাজ-জীবনকে জড়িয়ে রেখেছিল। এই বিশ্রী-কাতর পরিস্থিতি রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের মতো আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বলা চলে এই পরিবেশ পরিস্থিতিই বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। অর্থাৎ বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এসব উত্থান-পতনময় ঘটনা-সংঘাতের ধারাবাহিকতাকে তিল তিল করে সঞ্চিত করে তবেই এই নাট্যআন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> এই আন্দোলনকে আকস্মিক উত্তেজনার ফলে সৃষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গণআন্দোলন বলিয়া মনে করা হইলে ভুল করা হইবে; একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহার পশ্চাতেও জাতির একটি সুদীর্ঘ তপস্যা অলক্ষিতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।[৩]

কাজেই গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিচার এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে সেই বিশাল প্রেক্ষাপটের যৎসামান্য উপস্থাপন করছি।

বিশ শতকের গোড়া থেকে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীতে জনমত জাগ্রত হতে থাকে। সৌভ্রাতৃত্বের সাম্যবাদী ধারণা এবং জাতীয় আত্মনির্ধারণের প্রশ্ন–এই দুই প্রবণতার বিস্তারে আন্তর্জাতিক বিশ্বে শক্তি-সাম্যের তথাকথিত চূড়ান্ত ব্যবস্থায় ঘা পড়লে সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)। যুদ্ধের ফল হিসেবে দেখা দেয় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, ক্ষয়-জরা, হতাশা, দারিদ্র্য প্রভৃতি। আর এই বিপর্যস্ত অবস্থাতেই ক্রমে স্বৈরতন্ত্র বা ফ্যাসিজম মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ইতালিতে মুসোলিনী[৪], জার্মানিতে

হিটলার[৫], জাপানে প্রধানমন্ত্রী তোজো[৬] এবং স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্ক[৭] গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে হটিয়ে তাঁদের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই বর্বর শক্তির নির্মম শাসন-শোষণ ও আক্রমণে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। কালক্রমে এই বর্বর শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দিকে দিকে দেখা দেয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রয়াস। গোটা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও সব শ্রেণির প্রগতিশীল মানুষ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী হয়ে ওঠেন। ফলে :

> ১৯২২ সালে গড়ে ওঠেছে 'ইন্টারন্যাশনাল পীস কংগ্রেস'। ১৯২৩-এ 'কমিটি অফ অ্যাকশন এগেইনস্ট ওয়ার-ডেঞ্জার এন্ড ফ্যাসিজম'। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে গড়ে ওঠেছিল ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধবাদী একটি সম্মেলক লীগ– ১৯৩১ সালে আহূত হলো 'ওয়ার রেজিস্টার ইন্টারন্যাশনাল' এবং ১৯৩৩-এর জুনে প্যারিসে কমিউনিস্ট, সোস্যাল ডেমোক্রাট এবং অন্যান্য প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ইউরোপীয়ান অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ওয়ার্কার্স কংগ্রেস'-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রোঁমা রোঁলার উদ্যোগে এরই সমকালে আমস্টার্ডামেও অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ফ্যাসিজম ও যুদ্ধবিরোধী কংগ্রেস'-এর অধিবেশন।[৮]

সারা বিশ্বে যখন ফ্যাসিবিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী মনোভাব এবং কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন ভারতবর্ষের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়তে থাকে। বিশ্বব্যাপী এই কর্মতৎপরতার পাশাপাশি ভারতীয় প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরাও আলোড়িত হতে থাকেন। ফলে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।[৯] ভারতের বাইরে পার্টি গঠিত হলেও দেশের মধ্যেও একই সঙ্গে বেশ কটি কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করছিল। বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে তরুণ কমিউনিস্টদের কাছে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই পার্টির সেই সময়ের কাজ ছিল। এরপর ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হবার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি যখন ক্রমাগত সংহত হতে থাকে, তখন ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কারণে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। [১০] কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও পার্টির ছত্রপুষ্ট প্রগতিবাদী শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আরো বেশি সোচ্চার হতে থাকেন। এইরূপ একটি পরিস্থিতিতে 'বিশ্ব লেখক সংঘ' তৈরি হয় ১৯৩৬ সালে ২১ জুন। ইউরোপে বিশেষত লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্ররা এই সকল ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ১৯৩৫ সালে 'প্রগতি লেখক সংঘ' স্থাপন করেন। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে হিন্দি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার মুন্সী প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' তৈরি হয়।[১১] এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৩ সালের ২২ মে থেকে ২৫ মে বোম্বে শহরে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র অনুষ্ঠিত সম্মেলনের (চতুর্থ সম্মেলন) শেষ দিনে গণনাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৮৮৯–১৯৫৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯–১৯৮২), বিনয় ঘোষ (১৯১৭–১৯৮৯) শম্ভু মিত্র (১৯১৫–১৯৯৭), বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫–১৯৭৮) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁদেরই প্রচেষ্টায় সেখান থেকে সর্বভারতীয় সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'Indian Peoples Theatre Association' (I.P.T.A.) বা 'ভারতীয় গণনাট্য

সংঘ'।[১২] সমকালীন ভারতবর্ষে যুদ্ধের অভিঘাত থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সংকট, সাম্প্রদায়িকতার বিষচক্র, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের জোয়ার, পঞ্চাশের মন্বন্তরের করাল গ্রাস, সমস্ত পরাধীনতার বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহ, ভারতব্যাপী আগস্ট আন্দোলনের ডাক, সাম্যবাদী চেতনার অন্তঃপ্রবাহ—এসব মিলে যে উত্তাল প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল তার সামগ্রিকতাকে নাটকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করার ক্ষমতা তৎকালীন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের ছিল না। এসব প্রবণতা তাৎক্ষণিকভাবে নাটকে ও গানে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে এসেছিল I.P.T.A. ১৯৪৩ সালের মে মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন উপলক্ষে তৎকালীন 'নাট্যভারতী' (বর্তমানে গ্রেস সিনেমা)-তে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটোরি', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে I.P.T.A.-এর পথ চলা শুরু হয়।[১৩] ভারতবর্ষের বিশ্রী-কাতর পরিস্থিতির পাশাপাশি মার্কসীয় দর্শন ও ব্রিটিশ সরকারের কলঙ্কিত রাজনীতি এবং তৎকালীন যুগ-পরিবেশের নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র অবলম্বনে বেশ কিছু নাটক রচনা করে যিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটা নবধারার ও বিশেষ যুগ-প্রতিষ্ঠাতার আসন লাভ করেছেন, তিনি হলেন নট-নাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭৮)।

চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে গণনাট্য আন্দোলন ও বিজন ভট্টাচার্য নামটি সমার্থক হয়ে উঠেছিল। সে সময়ে মার্কসের দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা নাটক রচনায় সার্থকতা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান শীর্ষে। মন্বন্তরের পটভূমিকায় সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা ও বাঙালি জীবনের নানা অনুষঙ্গ তাঁর নাটকে যে মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা আর কোথাও দেখা যায় না। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর সাহিত্য-সাধনার অন্যান্য দিকের চর্চা অব্যাহত রেখেও ১৯৪৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের নাট্যজীবনে মোট ২৬টি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর রচিত নাটকগুলোর প্রকৃতি অনুসারে বিভাজন করলে এরকম দাঁড়ায়: একাঙ্ক ৯টি, পূর্ণাঙ্গ-১৩টি (একাঙ্ক 'মরাচাঁদ'-এর পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক 'কলঙ্ক'-এর পূর্ণাঙ্গরূপ 'দেবীগর্জন'সহ), রবীন্দ্রগল্পের নাট্যরূপ ২টি, গীতিনাট্য ১টি এবং রূপকনাট্য ১টি। এই ২৬টি নাটকের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১০টি এবং অবশিষ্ট নাটকের কিছু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, আর কিছু অপ্রকাশিত থেকে গেছে।

তাঁর প্রথম নাটক *আগুন* (১৯৪৩), যার অভিনয়ের মাধ্যমে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র পথ চলা শুরু হয়েছিল। পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আপাত-বিচ্ছিন্ন দৃশ্য সম্বলিত এই একাঙ্কটি সম্পর্কে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর *নবান্ন* নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, 'তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে *আগুন* ছিল একটি পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্র নাটিকা'। এখানে তিনি পুরোপুরি সফল হতে না পারলেও মন্বন্তরের পটভূমিকায় ভুখা, উদ্বাস্তু, কৃষক ও অন্নহীন মানুষের পাশাপাশি মধ্যবিত্তের জীবন-সংগ্রামের ইতিহাসকেও স্পষ্ট করে চিত্রিত করেছেন। এ ছাড়াও কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মহাজনদের চরিত্রটিও এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে স্পষ্ট করে। মন্বন্তর-পীড়িত মানুষকে যে কালোবাজারি মহাজন শ্রেণি মানুষ জ্ঞান না করে ইতর প্রাণি বিশেষ ভাবত তার প্রমাণ মেলে নিচের সংলাপ থেকে:

> সিভিক গার্ড : থাক তোকে আর দালালি করতে হবে না। যা ভাগ্, ভাগ্।
> চতুর্থ পুরুষ : (অপমানিত হয়ে) আমি কুকুর নই।
> সিভিক গার্ড : মানুষ নাকি![১৪]

এরপর নাটকের শেষদিকে দেখা যায় যে, সামান্য চালের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করার কারণে চতুর্থ পুরুষটি এবং আরও অনেকে মহাজনের লোকের হাতে মার খায়। মার খাওয়ার পর 'এখন বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে মিলেমিশে থাকতে হবে, ব্যাস।'[১৫] –সাধারণ মানুষগুলোর এই যে উপলব্ধি তা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের সংঘবদ্ধ হওয়ারই সচেতন প্রয়াস।

সাধারণ মানুষগুলোর এই সচেতন প্রয়াস নাট্যকারের দ্বিতীয় নাটক *জবানবন্দী* (গ্রন্থাকারে ১৯৬২)-তে এসে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রূপ গ্রহণ করেছে। চারটি দৃশ্য সম্বলিত এই একাঙ্ক নাটকটি ১৯৪৪ সালের ৩ জানুয়ারি 'গণনাট্য সংঘে'র প্রযোজনায় 'স্টার থিয়েটারে' অভিনীত হবার পর থেকে অবিভক্ত বাংলার শহর-বন্দর, নগর, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও অসংখ্য বার অভিনীত হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের সর্বাধিক অভিনীত নাটক এটি। নাট্যকারের পূর্ববর্তী নাটক *আগুন* স্কেচধর্মী রচনা, কিন্তু *জবানবন্দী*র গল্পাংশ গড়ে ওঠেছে একটি ধারাবাহিক কাহিনি নিয়ে। তাই '*জবানবন্দী*কে বলা যেতে পারে *নবান্ন* নাটকের প্রাক্-খসড়া'।[১৬] এতে চারটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দৃশ্যের পটভূমি নিরন্ন বাংলার কোনো এক নির্বিশেষ গ্রাম, যেখানে কৃষক পরিবারের কর্তা পরান মণ্ডলের পরিবারের দৈনন্দিন অনশন-অর্ধাশন–দু'মুঠো খাবারের আশায় সপরিবারের কলকাতায় আগমন। দ্বিতীয় দৃশ্য কলকাতার ফুটপাত। সেখানে আরও অনেক ছিন্নমূল পরিবারের পাশাপাশি পরানের সংসার। ফুটপাতে সভ্য ও ভদ্র সমাজের অবহেলা বা ঘৃণার বোঝা মাথায় নিয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত। অনাহার অপুষ্টিতে ধুকে ধুকে একদিন বেন্দার শিশুপুত্র মানিকের দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া। তৃতীয় দৃশ্যে বেঁচে থাকার তাগিদে দু'মুঠো খাবারের জন্য পতিভক্তিপ্রাণা কৃষক রমণীর ফুটপাতে এসে অর্থের বিনিময়ে সতীত্ব বিসর্জন। চতুর্থ দৃশ্যে পরান মণ্ডলের অনাহারে অর্ধাহারে করুণ মৃত্যুবরণ এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সবাইকে গ্রামে ফিরে যাবার আহ্বান বর্ণিত হয়েছে। এই নাট্যকাহিনিতে কৃষকের নানা দুরবস্থা, অভাব-অভিযোগ, অনাটনে কৃষক রমণীর সতীত্ব বিসর্জন, ক্ষুধার জ্বালায় শিশুর মৃত্যু প্রভৃতি মর্মান্তিক ঘটনা গভীর দরদের সঙ্গে চিত্রিত হলেও কৃষককে নায়ক করার মতো কোনো চেষ্টা কিংবা শ্রেণি-সংগ্রামের কথা এতে নেই। তবে শহরের এক ধরনের ভদ্রলোক শ্রেণি এবং ঈশ্বর সম্পর্কে অভিযোগ আছে। জরা-ক্লিষ্ট বৃদ্ধ পরান সংসারের ঘানি টানতে পারে না, দুঃখ কষ্টে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভগবানের নাম ডাকে, তখন তার ছেলে বেন্দা তাকে যা বলে তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি এক জোরালো ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে:

> (ক্ষোভের সুরে) না, তুমি আর ও নাম নিতি পারবা না মুখি, এই বলে দেলাম। (সখেদে) ঐ নাম সে দিন জ্যাঠাও করিছিল। মাথার কাছে বসেছিলাম আমি। আমি জানি সব। হায় পরমেশ্বর, হায় ভগবান বলে কত চোখির জল ফ্যাললে জ্যাঠা। কিছুতেই কিছু হলো না। শেষ কালে ঐ নামডাই য্যানো শক্ত এট্টা ইঁটির ড্যালার মত দেবে বসলো জ্যাঠার গলার মধ্যি। দম পর্যন্ত নিতি পাল্লে না জ্যাঠা! মরে গেল। তা তুমিও আর নিও না ও নাম মুখি।[১৭]

আর যে ভদ্রলোক শ্রেণির ওপর এখানে অভিযোগ আছে, মার্কসীয় তত্ত্ব মতে, সেই ভদ্রলোক শ্রেণি তথা বুর্জোয়া শ্রেণি মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্ত আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। হিসাব-নিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস। নগদ টাকার

বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি। মার্কস এঙ্গেলস-এর মতে, 'The bourgeoisie has left remaining no other nexus between man and man than naked self interest, than callous 'Cash Payment'.'[১৮] *জবানবন্দী* নাটকের ভদ্র যুবকও বুর্জোয়াচিত কায়দায় আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বেন্দার স্ত্রীকে বাধ্য করেছে সম্ভ্রম বিক্রি করতে। নাট্যকাহিনির এসব ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা মর্মান্তিক পরিবেশ রচনা করেছে। পরানের মৃত্যু সেই পরিবেশকে আরও করুণ করে তুললেও নাট্যকার তার মধ্যে নতুন করে বাঁচার আশায় সোনাধানের দুঃস্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মাঠের রাজা পরান মণ্ডল মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও সেই দুঃস্বপ্নময় সোনা ফলানোর আহবান করেছে এভাবে:

> ঘরে ফিরে যা রমজান– তোরা সব ঘরে ফিরে যা। আমার– আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে। [১৯]

এই মর্মান্তিক সুরের নাটকখানি I.P.T.A.-এর প্রযোজনায় অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের জগতে IPTA একটি শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। তবে 'এর ত্রুটি সম্ভবত এই যে, তাতে নিঃশ্বাস ফেলবার কোনো অবকাশ নেই–হাসি নেই, গান নেই, ট্র্যাজিক রিলিফ কোথাও মেলে না।'[২০] এখানে আছে শুধু সত্যনিষ্ঠা, ঘটনা আর বলিষ্ঠ সংলাপ। আর এ জন্যই নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অসংখ্য বার অভিনীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে '*জবানবন্দী*তে কৃষকদের দুরবস্থার কথা গভীর দরদের সঙ্গে বলা হয়েছে–তার জন্য দর্শকের মনে অন্যসব প্রশ্ন চাপা পড়ে গেছে। মানবিকতাই এখানে প্রধান প্রেরণা হয়ে ওঠেছে।'[২১] ঘটনা ও সংলাপের সুষ্ঠু প্রয়োগে *জবানবন্দী* সেই সময়কার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরে ব্যাপক জনসাধারণের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। আর তাই এটি সর্বাধিক অভিনয় সাফল্য লাভ করে গণনাট্য আন্দোলনকে করেছিল বেগবান। শুধু বাংলার গণনাট্য আন্দোলনেই নয়, সে সময়ে এর হিন্দি অনুবাদ *অন্তিম-অভিলাষ* বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়ে হিন্দিভাষি দর্শকেরও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

গণনাট্য আন্দোলনের ধারায় বিজয় ভট্টাচার্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক হলো *নবান্ন* (১৯৪৪)। তৎকালীন নাট্যআন্দোলনে *নবান্ন* নাটকের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এতটাই গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'নবান্নের কাল' বলে একটি বিশেষ সময় চিহ্নিত হয়ে আছে। *নবান্ন* বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। এটি 'প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পুরানো যুগের নাট্য বিষয়বস্তু ও নাট্যাঙ্গিকে ঘটল এক প্রবল বিস্ফোরণ।'[২২] মন্বন্তর-আশ্রিত উদ্দেশ্যমূলক এ নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে নিয়ে এল আঙ্গিক প্রকরণের অভিনবত্বের চমক। তবে এই অভিনবত্ব হঠাৎ করে আসেনি। নাট্যকারের পূর্ববর্তী নাটক *জবানবন্দী* ছিল এর সৃষ্টির পদসোপান। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের আহ্বায়ক এই *নবান্ন* নাটকটির রচনা প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই বলেছেন:

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আধিবিদৈক দুর্ঘটনা এবং দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে চূড়ান্ত একটা পরিণতির দিকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটি সমস্যা এমন বিরাট আর ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে যেন মনে হচ্ছে অনর্থ যা কিছু ঘটছে তার উপর মানুষের যেন কোনো হাত নেই। সচেতন বুদ্ধিজীবী মনও তখন সংশয় আর বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায়

> ঘূর্ণায়মান। চরমতম এমনই সেই দুঃসময়ে 'জবানবন্দী'র ইঙ্গিতের সূত্রধার শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার দেশ মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান সমাদ্দারের নতুন জবানবন্দীতে 'নবান্ন' নাটক লিখতে বসলাম। মুমূর্ষু পরান মণ্ডলের চোখের সোনাধানের দুঃস্বপ্নই প্রধান সমাদ্দারের চোখে প্রতিভাত হয় জবাকুসুমসংকাশং রূপে। মৃত্যুকে বরণ করবার দুর্দমনীয় সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়ে সে করে মৃত্যুকে অস্বীকার।[২৩]

নবান্ন-এর কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে চারটি অঙ্কে, পনেরোটি দৃশ্যে। নাট্যকাহিনি শুরু হয়েছে বাংলার কোনো এক পল্লী আমিনপুরে একটি দাঙ্গা-হাঙ্গামার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের আন্দোলন। এরপর আকস্মিক বন্যা-সাইক্লোনে আমিনপুর প্লাবিত–ছিন্নভিন্ন। প্রধান সমাদ্দারসহ গ্রামের কৃষক সমাজ মন্বন্তরের শিকার। এরই মাঝে কালোবাজারি মহাজনের সর্বগ্রাসী শোষণ। সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলো বাঁচার তাগিদে পাড়ি জমায় কলকাতায়। এখানে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি, দু'মুঠো খাবার জোগাড় হয় না। একটু নোংরা খাবারের জন্য ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়েও পরাজিত হয় তারা। ধনিক শ্রেণির নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করতে না পেরে প্রধানের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। সারি সারি মৃত দেহ যেখানে সেখানে। এর মাঝেও বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে পুনরায় গ্রামে ফেরা এবং গাঁতার খেটে চাষাবাদ শুরু ও নবান্নের উৎসব। *নবান্ন*-এর গল্পাংশের এই হৃদয়-বিদারক করুণ পরিণতির কথা ভেবে সুনীল দত্ত বলেছেন, 'দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত বাঙ্গলার যে দৃশ্য ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন।'[২৪] বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে উচ্ছৃঙ্খল রাজনৈতিক পটভূমি, ৪৩-৪৪ সাল জুড়ে মন্বন্তর ও মহামারীতে সাধারণ মানুষ নিরুপায়–বাংলায় ধান নেই, চাল নেই, ঔষুধ নেই, সহায়-সম্বল কিছুই নেই; শুধু আছে হাহাকার ও আহাজারির অগ্নিদাহে ছারখার হয়ে যাওয়া বাংলা। এ সময় জীবনের বলিষ্ঠ সংগ্রামকে রূপ দিয়ে যারা নিজের করে নিতে পেরেছে, কেবল তারাই বেঁচেছে। যারা পারেনি তারা বাঁচেনি। এমনি করে অনেকে মরেছে। বাংলা তখন তৈরি হয়েছে মৃত্যুর কারাগারে। তবু নিঃশব্দ এই কারাগার থেকে জীবনের ঝংকার উঠতে দেখা যায়। এই ঝংকারই *নবান্ন* নাটকের কাহিনি–বলিষ্ঠ এক জীবন-সংগ্রামের কাহিনি। নাটকের এই সংগ্রামী জীবনবোধের মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই, কোনো ছলাকলা নেই। তাই এই বিরাট সংগ্রামশীল জীবন-কাহিনি হয়ে ওঠেছে সমকালীন 'সামাজিক অবক্ষয়ের দলিল'।[২৫]

নবান্ন প্রথম অভিনীত হয় ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায়। এর নির্দেশনায় ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র। অভিনয় করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান, গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ, সজল রায়চৌধুরী, রঞ্জিত বসু, অজিত মিত্র, গোপাল হালদার, বিমলেন্দু ঘোষ, মণিকুন্তলা সেন, শোভা সেন, তৃপ্তি ভাদুড়ী (পরে তৃপ্তি মিত্র), ললিতা বিশ্বাস, মণিকা ভট্টাচার্য প্রমুখ দেশবরেণ্য নাট্য-ব্যক্তিত্ব। বলা চলে সে সময়ে গণনাট্য আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন এঁরাই। শ্রীরঙ্গমে *নবান্ন*-এর সফল অভিনয়ের পর নাটকটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভিন্ন মঞ্চে মঞ্চস্থ হতে থাকে। গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় *নবান্ন*-এর সফল অভিনয় একদিকে সর্ব-ভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যেমন জোরদার করে তোলে, তেমনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিজন ভট্টাচার্যের নাম চিরস্থায়ী করে দেয়। এ প্রসঙ্গে শোভা সেনের স্বীকারোক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

> 'নবান্ন'-এর সাফল্য যেন আমাদের আদর্শের চ্যালেন্জ। তাই 'নবান্ন' হয়ে আছে ইতিহাসে অমর। নাট্যপ্রয়োগ, বিষয়বস্তুতে, দলগত অভিনয়ে। সমষ্টিগত অভিনয় ছিল 'নবান্ন'-এর সবচেয়ে বড় বিস্ময়। শিশিরকুমার, নির্মলেন্দু বা দানীবাবুর টিকি খুঁজে পাওয়া যায়নি আমাদের মধ্যে। কিন্তু আমরা সবাই মিলে হয়েছিলাম অনেক বেশি শক্তিমান। এই অভিনয় ও নাটকের পুরো কৃতিত্ব বিজনবাবুর।[২৬]

গণনাট্য সংঘের উদ্দেশ্য বা আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন *নবান্ন* নাটকে ঘটেছিল বলেই গণনাট্য কর্মীরা *নবান্নের* অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়েছেন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কল্যাণে নিজেকে করেছেন সমর্পিত। এই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাই 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' শহরভিত্তিক শিল্পীদের সংগঠিত করে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে প্রথম বারের মতো তাঁদের গণমানুষের কাতারে সামিল করতে সক্ষম হয়েছিল। I.P.T.A.-এর উদ্যমী অভিনেত্রী শোভা সেনও বলেছেন, 'যতদিন 'নবান্ন'-এর অভিনয় চলেছে, তারই মধ্যে প্রথম উপলব্ধি করেছি নাটকের মধ্য দিয়ে কীভাবে দেশের কাজ করা যায়, জনসাধারণের সঙ্গে কতখানি গভীর যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।'[২৭] *নবান্ন*-এর অভিনয় শুধু আমাদের সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনেই প্রভাব বিস্তার করেনি, বরং 'সমাজ-সচেতন এই নাটকের অপূর্ব অভিনয় বাংলার নাট্যজগতেও এক বিদ্যুৎ চমক সৃষ্টি করেছিল'।[২৮] *নবান্ন* শুধু কলকাতায় নয়, বর্ধমান, মেদিনীপুর, যশোরসহ অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। গণনাট্য আন্দোলনকে *নবান্ন* যেভাবে পরিণতি ও প্রত্যয় দান করেছে, তা আর কোনো নাটক পারেনি। গণনাট্য আন্দোলনে প্রতিনিধিত্বকারী এই নাটকই শেষপর্যন্ত বিজন ভট্টাচার্যকেও এনে দিয়েছে গণনাট্য আন্দোলনের নায়কের অপার মহিমা।

বাংলা নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) এর ঐতিহ্যকে স্মরণ করেও নতুন যুগের দর্শনভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিজন ভট্টাচার্য প্রমাণ করেছেন যে, দেব-দেবী, নবাব-বাদশা ও জমিদারদের খামখেয়ালিপনার ইতিহাস থেকে নাট্যবিষয়বস্তু পৃথক ও মহান। সুদর্শন নায়ক-নায়িকার পরিবর্তে সাধারণ চেহারার মানুষ—যাদের অভিনয়যোগ্য কণ্ঠ আছে, তাদের দিয়েও যে অসাধারণ নাট্যক্রিয়া সম্ভব সেটিও তিনি প্রমাণ করেছেন। দেশের অবহেলিত জনগণ যাঁদের চরিত্র এতদিন পর্যন্ত অধিকাংশ নাটকে দৃশ্যান্তর কিংবা বিরতির ফাঁক পূরণে সাহায্য করত, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতাকে মূর্ত করে তুলেছেন বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর *নবান্ন* নাটকের মাধ্যমে বাংলার নিরন্ন কৃষক, সাধারণ উপেক্ষিত-অবহেলিত নিম্নশ্রেণির মানুষের পাশাপাশি 'ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনকে তিনি মঞ্চে নিয়ে এলেন।'[২৯] আর গণনাট্য আন্দোলনের লক্ষ্যও ছিল শিল্প-সাহিত্যে সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষের প্রতিষ্ঠা দেওয়া। কাজেই গণনাট্য আন্দোলন ও *নবান্ন* একটি আরেকটির পরিপূরক—বিচ্ছিন্ন করার উপায় নেই। এ নাটকটি বিষয়বস্তু, ভাব ও অভিনয়ের দিক থেকে বাংলা নাটকে যুগান্তকারী দিক পরিবর্তনের সূচনা করে। এ জন্য 'গণনাট্য সংঘ, বিজন ভট্টাচার্য এবং *নবান্ন* পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।'[৩০]

গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাট্যকার-অভিনেতাগণ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিজন ভট্টাচার্যও মার্কসীয় চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে নাটক রচনা, পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন। তাই কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের

জীবন-সংগ্রাম ও বাঁচার লড়াই তাঁর নাটকের মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠেছে। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই নাটক ও নাট্যাভিনয়ের যে নবীন জীবন ভাবনা, উপেক্ষিত কৃষক-শ্রমিকের উপস্থিতি, সংগ্রামী জীবন-চেতনা, মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের প্রাধান্য প্রকাশ পেতে থাকে, গণনাট্যের অন্যতম পুরোধা হিসেবে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্মে তারই সার্বিক পটোত্তোলন ঘটেছিল।'[৩১] আর এই কাজটি সম্পন্ন করতে সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করেছে *নবান্ন* নাটকখানি। এতে বাংলার মেহনতি-নিরন্ন কৃষক জীবনের চালচিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা আর কোথাও দেখা যায় না। এর প্রায় ৮৫ বছর পূর্বে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে কেবল তার আংশিক প্রয়াস দেখা যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন:

> বস্তুতঃ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'–এর পর দেশের নিরন্ন কৃষক সমাজের স্বপ্ন-সংগ্রামকে অবলম্বন করিয়া 'নবান্ন-এর মত নাটক আর দ্বিতীয়টি রচিত হয় নাই।[৩২]

গণনাট্য আন্দোলনের পরিণতির কালে *নবান্ন*-এর মঞ্চ সফলতা ও জনপ্রিয়তা শুধু বাঙালি মানসেই সাড়া জাগায়নি, বরং প্রগতিবাদী অনেক অবাঙালির মনেও এটি গভীরভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রীরঙ্গমে এর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাই একজন ব্রিটিশ পাইলট বিজন ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত সেই চিঠির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি:

> Out of the agony of the grapes, comes the glory of the wine. Out of the agony of the people, comes the glory of the nation. Those words express better than any of mine that which I saw last night. In your play I saw the agony and the potent spirit of India more clearly and vividly than I have even seen it before. ...If my wishes could come true it would be good if you could produce your play in London. Every British men and women should see it.[৩৩]

নবান্ন-এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে ফ্যাসিবাদের কাছে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয়, গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের মরণপণ (Do or die) সংগ্রামে অসাফল্য, মেদিনীপুরে সাইক্লোন ও ভয়াবহ বন্যা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, কালোবাজারি ও চোরাকারবারির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের অন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্র এতে স্পষ্ট না থাকলেও অনেক ঘটনারই আভাস আছে। ব্রিটিশ সরকার রচিত নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনের ছাড়পত্র নিতে হয়েছিল বলে সব সমস্যা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হয়নি।[৩৪] তবু এদেশের মানুষ *নবান্ন*-এর মর্মবাণী বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেননি। এই বিশাল বিস্তৃত ঘটনারাজি একসঙ্গে নাটকীয় বৃত্তে গ্রথিত করতে গিয়ে নাট্যকারকে ছিন্ন করতে হয়েছিল প্রচলিত নাট্যাঙ্গিক ও নাট্য-বিষয়ের জটাজাল। তাই নাটক হিসেবে *নবান্ন*-এর গঠন বিষয়ে সে সময়ে এর বিরূপ সমালোচনা করে অনেকে একে 'অসংলগ্ন নাটক' বলেছিলেন। আসলে 'এই আপাত অসংলগ্নতার অন্তরালে বহমান ব্যাপক পরিবেশীয় ঐক্যই 'নবান্নে'র গঠন-ধর্ম'।[৩৫] কেননা নাটকটি রচনার প্রেক্ষাপটটি ছিল চরম উত্তাল। ৪২-এর আগস্ট মাসে গান্ধীজী যখন ব্রিটিশ উৎখাতের মরণ পণ 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্র দেন তখন বঙ্গদেশ, বিহার, উত্তর-প্রদেশে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। বাংলাদেশে মেদিনীপুরের জনসাধারণ সুসংঘবদ্ধ হয়ে থানা ও অন্যান্য সরকারি অফিস আক্রমণ করার চেষ্টা করে। ঐ সময় ৭২ বছর বয়সী

মাতঙ্গিনী হাজরা শোভা যাত্রায় নেতৃত্ব দেন। পুলিশ গুলি ছোড়ে। বন্দুকের একটি গুলি তাঁর বাহুতে আঘাত হানে। নির্ভীক মাতঙ্গিনী তবু থামেন না। আরেকটি গুলি তাঁর কপাল ভেদ করে যায়। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ঐ অবস্থাতেও উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে তাঁর হাতে স্বাধীনতার পতাকা আঁকড়ে ধরা ছিল।[৩৬] এই উত্তাল গণসংগ্রামের চিত্রটি বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্যে কৌশলে চিত্রিত করেছেন। নাটকের আমিনপুর আসলে মেদিনীপুর, পঞ্চাননী হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা আর বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ হলো বন্দুকের গুলোর শব্দ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারে যখন আমিনপুরের কৃষক-সমাজ অতিষ্ঠ, প্রতিকারের আন্দোলনে যখন প্রধানের দুই পুত্র নিহত, গ্রামের নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে যখন টানাটানি, তখন সবাই ভীত হলেও মাতঙ্গিনী হাজরা সদৃশ বৃদ্ধা পঞ্চাননী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। পুলিশের গুলো তাঁরও কপাল ভেদ করে। তবু তিনি আন্দোলনে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানাতে থাকেন। নাট্যকারে ভাষায়:

পঞ্চাননী: আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস্। পেছোসনি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।[৩৭]

এরপর আমিনপুরে হঠাৎ ভয়াবহ বন্যা-সাইক্লোন, ঘর-বাড়ি, ফসল সবকিছু উজাড়, দুর্ভিক্ষ-মহামারিতে কৃষক সমাজ দিশেহারা, এরই মাঝে হারুদত্তের মতো স্বার্থান্বেষী মহাজনের কাছে সর্বস্ব হারিয়ে তারা কলকাতায় আসে। এখানে ভিক্ষা করেও দুটো খেতে পায় না। অবশেষে বাঁচার তাগিদে দুটো নোংরা খাবারের জন্য ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে, কিন্তু কুকুরের কামড় খেয়ে এখানেও পরাজয় ঘটে। অথচ এই সময়ে সমাজের বড়বাবুরা কত শত ভদ্রবেশী স্বার্থান্বেষী লোককে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় মৃতপ্রায় মানুষগুলোর আর্তনাদ তাদের কানে পৌঁছে না। এই অমানবিক, নিষ্ঠুর আচরণ দেখে প্রধান সমাদ্দার ক্ষোভে-দুঃখে-ঘৃণায় উঁচুতলার মানুষগুলোর প্রতি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে:

আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে! তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু![৩৮]

এরপর ভাত নয়, সামান্য ভাতের ফ্যানের আশায় বড়বাবুদের বাড়ির ড্রেনের কাছে কুকুর আর মানুষ পাশাপাশি বসে অপেক্ষা করে। একই উদ্দেশ্যে পাশাপাশি বসে থাকা ভিন্ন জাতের দু'টি প্রাণির মধ্যে তখন যেন আর পার্থক্য থাকে না। চারিদিকে বুভুক্ষুর হাহাকার-আহাজারি এবং পেটের জ্বালায় উদ্বাস্তু মানুষগুলো তখন নির্জীব, অসার—'মৃত্যুর অপেক্ষায় সময় গণনারও সাধ্য তাদের নেই।'[৩৯] এই রূঢ় সামাজিক অবক্ষয়ের কাহিনি প্রচলিত নাট্যাঙ্গিকে চিত্রিত করা যায় না। এ জন্য *নবান্ন*-এর আঙ্গিক-প্রকরণও ভিন্ন। এর নাট্যাঙ্গিক বিচার করতে হলে নতুন কানুন দরকার—গতানুগতিক কানুনে এর বিচার চলে না।

নবান্ন-এর পরে বিজন ভট্টাচার্য রচনা করেন একাঙ্ক *মরাচাঁদ* (১৯৪৬), *কলঙ্ক* (১৯৪৬), এবং পূর্ণাঙ্গ *অবরোধ* (১৯৪৭) নাটকটি। কিন্তু এ নাটক তিনটি গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় অভিনীত হয়নি। *মরাচাঁদ*-এ নাট্যকার পবন বাউলের গানের মধ্য দিয়ে সমাজের একেবারে নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন-সংগ্রামকেই চিত্রিত করেছেন। *অবরোধ* নাটকটি কমিউনিজমের আদর্শে কারখানার মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে রচিত, তবু কারখানার

মালিকের পুঁজিবাদী স্বরূপ সম্পর্কে নাট্যকারের অনভিজ্ঞতার কারণে গণনাট্য সংঘ এ নাটকটিকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই গণনাট্যের আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হলেও এসব নাটক গণনাট্য আন্দোলনে *নবান্ন*-এর মতো ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

গণনাট্য আন্দোলনের ধারায় বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে *জীয়ন কন্যা* (১৯৪৮) গীতিনাট্যটি। এতে বেদে সমাজের নানা সংস্কার, ঐতিহ্য-লালিত প্রথা-পদ্ধতি, জাতিগত বিশ্বাস প্রভৃতির সঙ্গে দেশবিভাগের আশঙ্কায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-বিদ্বেষের চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। সর্প-বিশারদ বেদে সমাজের সঙ্গে ছিল নাট্যকারের আবাল্য পরিচয়। তিনি বাল্যকালে ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ এলাকার সাপুড়েদের সাপ ধরা, সাপের খেলা, সাপকে নাচানো সবকিছু খুব কাছ থেকে দেখেছেন– তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।[৪০] এ ছাড়া বাংলার আউল-বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছিল তাঁর আবাল্য সখ্য। গান ও সুরের প্রতি ছিল তাঁর আজন্ম টান। তাই 'কাহিনীর লোক আখ্যানধর্মিতা ও রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে লোকগীতির মর্যাদাময় মেলবন্ধন 'জীয়নকন্যা'য় একটি সজীব স্পর্শময়তা সঞ্চার করেছে'।[৪১] তিনটি দৃশ্যের এ গীতিনাট্যটিতে দেখা যায় যে, বেদে-সর্দার প্রবীরের কন্যা উলুপীকে সর্প-দংশন করে, তাকে বাঁচানোর জন্যে নানা ওঝা-গুণীনের আনাগোনা, কিছুতেই কিছু হয় না। অবশেষে সমস্ত ওঝা-গুণীনের তন্ত্র-মন্ত্র একত্রে চালান করলে সর্প হাজির হয়। কিন্তু সর্প শোনায় নিরাশার বাণী:

শেষ কথাটা বলে যাই
বাইদ্যার কন্যার বাঁচন নাই।
আহা মহাদেশটা ঘুমাইছে
কল্‌জেটা মোর জুড়াইছে।[৪২]

তবু উলুপীকে বাঁচানোর জন্য গুণীনের দল বাণে বাণে সর্পকে অস্থির করে তোলে। শেষপর্যন্ত বিষমুক্ত করে উলুপীর মহাজাগরণ ঘটায় 'ভারত মাতার মতো'। আসলে এই প্রয়াস সর্পের বিরুদ্ধে নয়, এ তৎকালীন 'ক্যালাস সরকারের' বিরুদ্ধে এক বিশেষ প্রতিবাদ। *জীয়নকন্যা*র এই রূপক আশ্রয়ের কথা সুধী প্রধানও বলেছেন:

> *জীয়নকন্যা*র বিষয়বস্তু একেবারেই কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিভিত্তিক। সর্প দংশিতা উলুপীকে ভারতবর্ষের প্রতীক বলা যায়—যে পরাধীনতার বিষে মৃতপ্রায়। নানান গুণীনদের সমাবেশ করা হয়েছে তাকে বাঁচাবার জন্য। এই গুণীনগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক দল—যারা প্রত্যেকে বলছে তারা ভারতবর্ষের মঙ্গল চায়। কিন্তু বিষ তুলতে পারছে না, কারণ বিষ তোলার মন্ত্র যা ধন্বন্তরীদের 'সাতখানা হাতে পাঁচখানা হয়েছে' বলে তার জোর কমেছে।[৪৩]

আসলে গুণীনদের মন্ত্র 'সাতখানা হাতে পাঁচখানা হওয়া'র মধ্য দিয়ে ভারতের জনসাধারণের কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট প্রভৃতি অংশে বিভক্ত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। আর সকল গুণীনের একত্রে মন্ত্র চালান দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের সকল দলকে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের জন্য একসঙ্গে সংগ্রাম চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। কাজেই গণনাট্য আন্দোলনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা সুস্পষ্ট। তাছাড়া এই লোকফর্মের নাটকের মধ্যদিয়ে বাংলা নাটকে অভিনবত্ব আনায়নও নাট্যকারের কম কৃতিত্বের নয়। এ প্রসঙ্গে শোভা সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> *নবান্ন*-এর সাফল্যের পর আমাদের ও দেশবাসীর বিরাট প্রত্যাশা থাকে 'নবান্ন'-এর নাট্যকারের কাছে। তাই দিনের পর দিন অপেক্ষা করছিলাম আরেকটি বিদ্রোহের গান শুনতে। এল 'জীয়নকন্যা'। পড়া হল। এও এক অভিনব সৃষ্টি।[৪৪]

এই ধারাবাহিকতায় বিজন ভট্টাচার্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো 'দেবীগর্জন' (১৯৬৯)। এখানে নির্যাতিত-নিপীড়িত সাঁওতাল আদিবাসীদের জীবন-প্রণালী এবং এদের ওপর জোতদার, মহাজন, ভূস্বামীদের শোষণ-নির্যাতনের চিত্র যেমন আছে, তেমনি সর্বহারা মানুষের প্রতিরোধ-প্রতিকারের চিত্রও আছে। প্রকৃতপক্ষে *নবান্ন* (১৯৪৪) নাটকে যে বীজ উপ্ত হয়েছিল তা *দেবীগর্জন* নাটকে পরিণত নাট্যশরীর পরিগ্রহ করেছে। তিন অঙ্কে এগারোটি দৃশ্যের নাট্যকাহিনি সুসংহত। কাহিনিতে দেখা যায় যে, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিবাসী বাউরি সাঁওতাল চাষীদের বাস। জমিদারি-প্রথার বিলোপ সাধনের পর মধ্যস্বত্বভোগী প্রভঞ্জন বেনামিতে চাষীদের জমি নিজেদের তহশীলভুক্ত করে নেয়। পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থা বানচাল করে অবাধ নিষ্ঠুরতায় সামন্ততান্ত্রিক শাসন চালু করে সে। কৃষিঋণ আর কর্জাধানের সুদ যোগাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয় দরিদ্র ভুঁইচাষীর দল। তাদেরই জমির ধানে গোলা ভর্তি হয় প্রভঞ্জনের, আর তারাই থাকে নিরন্ন-উপবাসী। এই আধিপত্য প্রভঞ্জনের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার। যখন সে বলে, 'আমি রাজা, আমারই নীতি–ইটাই রাজনীতি'[৪৫] তখন তাকে চিনতে আর অসুবিধা হয় না। কিন্তু এক সময় সঞ্চারিয়া আর মংলার নেতৃত্বে জোটবদ্ধ ভুঁইচাষীরা পঞ্চায়েতী শাসন চালু করার ধ্বনি তোলে। মংলার মনে চেতনা জাগে- 'কে রাজা, কার রাজ্য'?[৪৬] তাই কৃষিঋণ আর কর্জাধানের সুদ প্রভঞ্জনকে ডিঙিয়ে সরাসরি সরকারি কাছারিতে জমা দিতে চায় চাষীরা। ধর্মগোলার মজুতধান অভাবের দিনে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার দাবিও জানায়। প্রভঞ্জন তাতে রাজি না হলে চাষীদের সঙ্গে তার লড়াই বাঁধে। সেই প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের সামনে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গেছে মধ্যস্বত্বভোগী প্রভঞ্জন। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার বিসর্জনের তালে তালে তখন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছে *দেবীগর্জন*। তাই এ নাটকটি হয়ে ওঠেছে 'জোটবদ্ধ প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞার নাটক'।[৪৭]

গণনাট্য আন্দোলনে লোকায়েত মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি এবং মেহনতি মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও বিপ্লব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গণনাট্য সংঘ সমকালীন নাট্য-আন্দোলনে এই জাতীয় নাটককেই গ্রহণ করেছিল বিশেষ আগ্রহে। বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকটির মাধ্যমে গণনাট্য আন্দোলনকে যেমন জোরদার করেছেন তেমনি বাংলার নিরন্ন কৃষক-সমাজের মুক্তির পথটিও দেখিয়েছেন। চন্দন খাঁ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> আমাদের দেশের অসংগঠিত কৃষক-সমাজ সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে বিপ্লবে সামিল হলে একদিন স্বপ্নের ভোর আসবেই। কম্যুনিস্ট বিজনবাবুও এই স্বপ্ন পথের অভিযাত্রী ছিলেন। তাঁর এই স্বপ্ন কিন্তু রোমান্টিক কল্পনাবিলাস নয়, এ স্বপ্নের মধ্যে মিশে আছে ঘাম, অশ্রু আর রক্তের নোনতা স্বাদ। কোন পথে কৃষক মুক্তি সম্ভব, নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই দিক-চিহ্নটি আলোচ্য নাটকে তুলে ধরেছেন।[৪৮]

এসব ছাড়াও বিজন ভট্টাচার্য সমাজের অবহেলিত-নির্যাতিত, শোষিত-বঞ্চিত নানা শ্রেণির মানুষের জীবন-সংগ্রাম অবলম্বনে *জননেতা* (১৯৫১), *গোত্রান্তর* (১৯৫৯), *ছায়াপথ* (১৯৬২), *চুল্লী* (১৯৭৪), *হাঁসখালির হাঁস* (১৯৭৭) প্রভৃতি নাটক রচনা করেছেন। গণনাট্য আন্দোলনের নাটকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন-ভাবনার স্থান নেই; সমষ্টির ভাবনাই এখানকার মূল

সুর। আর বিজন ভট্টাচার্যের এসব নাটকেও সেই সুরই বারবার ঝংকৃত হয়ে ওঠে। অথচ এসব নাটক তিনি রচনা করেছেন গণনাট্য সংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর। মতাদর্শগত কারণে সংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও গণনাট্য আন্দোলনের এই সুর-ঝংকারের বাইরে তিনি কোনোদিনই যেতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার বলেছেন:

> যাঁরা নাটক দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘকে উজ্জীবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য নানা কারণে গণনাট্য ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তাঁর নাটকে গণনাট্যের মূল লক্ষ্য অধিকাংশত বজায় ছিল।[৪৯]

তাঁর এ জাতীয় নাটকের মধ্যে *জননেতা*'য় খাদ্য সংকটের পটভূমিকায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলাদেশের একটি গ্রামের তথাকথিত জননেতার প্রতারক ভূমিকাটিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে উন্মোচিত করা হয়েছে। নাট্যকার গণনাট্যের আদর্শে তৎকালীন স্বার্থান্বেষী কালোবাজারিদের সঙ্গে সরকারের যোগসূত্রটিকেও চিত্রিত করেছেন। চরম অভাবের দিনে যখন নিরন্ন গ্রামবাসী সাধু খাঁর চোরা চালানের চাল ভর্তি লরী আটক করে তখন কালোবাজারি সাধু খাঁর সঙ্গে জননেতা নরেন্দ্রনাথের অন্তঃসম্পর্কটি উন্মোচিত হয় এভাবে:

> সাধু খাঁ : দেখ এট্টা কথা বলি। অযথা হাঙ্গামা করে ঐ চাল যদি তোমরা আটক রাখ তো ঘটনা খারাপ হয়ে যাবে। (জননেতা নরেন্দ্রনাথের কাছে এর সমাধান চেয়ে)
> কৃপানাথ : জবানীতে বলবেন না, আমরা চাল পাব কিনা তাই বলুন।
> নরেন্দ্রনাথ : আমিই বলছি, আমিই বলছি। (সাধু খাঁর সঙ্গে তাড়াতাড়ি কানে কানে ঘটনা শোনেন) ঐ চাল মিলিটারী রিকুইজিশন করেছে; সুতরাং ঐ চালের ওপর আমাদের কারো কোন হাত নেই।[৫০]

দেশ বিভাগের সময় মানুষের খাদ্য সমস্যার পাশাপাশি বাস্তু সমস্যাও প্রকট হয়ে ওঠেছিল। নাট্যকারের *গোত্রান্তর* নাটকটি সেই সময়ের কলকাতা শহরের উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। ছিন্নমূল গ্রামের স্কুল শিক্ষক হরেন মাস্টারের কাহিনি এতে স্থান পেলেও তা নিছক তার বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে নয়। বরং স্কুল শিক্ষক থেকে কিভাবে তিনি বস্তিবাসী শ্রমিকে গোত্রান্তরিত হলেন তারই করুণ ইতিহাস এ নাটকটি। মন্দিরা রায়ের মতে, 'ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিভাবে বস্তিবাসী সর্বহারা শ্রমিকের সগোত্র হয়ে ওঠেছে সেই গোত্রান্তরের ইতিহাস'[৫১]-এ নাটকটি। কাজেই নাট্যকার এখানেও সমষ্টির চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হননি।

সর্বোপরি এ কথা বলা যায় যে, গণনাট্য আন্দোলন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধে যে অভিনবত্বের আলোড়ন সৃষ্টি করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তার প্রাণপুরুষ ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। আর তাঁর রচিত নাটকসমূহ ছিল গণনাট্য আন্দোলন পরিচালনার হাতিয়ার স্বরূপ। তাঁর নাটকের অভিনয় যেমন গণনাট্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও এনে দিয়েছে নতুন নাট্যাঙ্গিকে বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গণনাট্য আন্দোলন এবং বিজন ভট্টাচার্যের নাটক তাই সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র

১. দর্শন চৌধুরী, *গণনাট্য আন্দোলন*, দ্বিতীয় প্রকাশ, (কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ১
২. মন্দিরা রায়, *গণনাট্য এবং নবনাট্য: একটি বির্তক*, (কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ২০০৪), পৃ. ৪

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সং., (কলকাতা: এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা.লি., ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৪৪

৪. 'Mussolini was a convinced internationalist and revolutionary, violently opposed to parliamentary activities and to the socialist acceptance of parliamentary procedure'. 'When Mussolini, after the elections of May 1921, became the leader of a partiamentary group he attempted to steer a more moderate course. Together with the National liberals of Salandra the Fascists formed the 'National Right', and Mussolini in his first parliamentary speech spoke out strongly against Socialists and Democrats'.

দ্রষ্টব্য: Carsten, F.L., *The Rise of Fascism*, (London: Methuen and Co., 1967), p. 21, 59.

৫. 'In the 1930, it was Hilter and National Socialist Germany who were admired and imitated by Fascist circles all over Europe, and not Mussolini's Italy'.

দ্রষ্টব্য: Ibid, p. 81

৬. দর্শন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮-৯

৭. সুধীন প্রধান, *নবান্ন: প্রযোজনা ও প্রভাব*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯), পৃ. ৮

৮. মন্দিরা রায়, *বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯২), পৃ. ৪

৯. অনিল বিশ্বাস, *কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মতাদর্শ*, পঞ্চম সং., (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৪), পৃ. ৫৯

১০. সরোজ মুখোপাধ্যায়, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯১), পৃ. ১; অনীক মাহমুদ, *আধুনিক বাংলা-কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ৪৮

১১. সুধী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

১২. দর্শন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭; *গণনাট্যের নবান্ন: পুনর্মূল্যায়ন*, (কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ১৯৯৭), পৃ. ১৯; মন্দিরা রায়, *গণনাট্য এবং নবনাট্য: একটি বির্তক*, পৃ. ১০; রুবেল আনছার, *বিজন ভট্টাচার্যের নাটক: সমকালীন জীবন ও সমাজ*, (রাজশাহী: ধ্রুব সাহিত্য প্রকাশন, ২০০৭), পৃ. ৪৭

১৩. সজল রায়চৌধুরী, *গণনাট্য কথা*, (কলকাতা: গণমন প্রকাশন, ১৯৯০), পৃ. ৩২-৩৩

১৪. বিজন ভট্টাচার্য, *আগুন* (৫ম দৃশ্য), বহুরূপী, সংখ্যা-৩৩, অক্টোবর-১৯৬৯, পৃ. ঊনচল্লিশ

১৫. *তদেব*, পৃ. চল্লিশ

১৬. মন্দিরা রায়, *বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত*, পৃ. ১৯

১৭. বিজন ভট্টাচার্য, *জবানবন্দী* (১ম দৃশ্য), বহুরূপী, সংখ্যা-৩৪, জুন-১৯৭০, পৃ. উনিশ

১৮. Karl Marx, Friedrich Engels, *The Communist Manifesto,* Reprinted, (London: Penguin Books, 1979), P. 82

১৯. বিজন ভট্টাচার্য, *জবানবন্দী* (৪র্থ দৃশ্য), পূর্বোক্ত, পৃ. একত্রিশ

২০. সজল রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

২১. অশোককুমার মিশ্র, *গণনাট্য আন্দোলন ও নবান্ন*, পরিমার্জিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সং., (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০১), পৃ. ৩৩

২২. *তদেব*

২৩. বিজন ভট্টাচার্য, *নবান্ন* (৪র্থ সং. ১৯৬২-এর ভূমিকা), পঞ্চম প্রমা সং., (কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ২৮-২৯

২৪. সুনীল দত্ত, *নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর*, দ্বিতীয় প্রকাশ, (কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭), পৃ. ১৯

২৫. তাপস ভট্টাচার্য, *বিজন ভট্টাচার্য: গণনাট্য আন্দোলন ও নবান্ন এবং*, (কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০০১), পৃ. ৪৭

২৬. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে: নবান্ন থেকে লালদুর্গ*, দ্বিতীয় সং., (কলকাতা: এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি., ১৯৯৬), পৃ. ২০

২৭. *তদেব*, পৃ. ২১
২৮. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, *বাংলা নাটক নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সং., (কলকাতা: বর্ণালী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২২৬
২৯. *তদেব*
৩০. দর্শন চৌধুরী, *গণনাট্যের নবান্ন: পুনর্মূল্যায়ন*, পৃ. ৪
৩১. ঐ, *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫), পৃ. ৩১১
৩২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪
৩৩. উদ্ধৃত, বিজন ভট্টাচার্য, "গণনাট্য আন্দোলনে সেকাল ও একাল", শিবাদিত্য দাশগুপ্ত (সংকলিত), *লিখন-ভাষণ-কথোপকথন: বিশিষ্ট বিজন*, (কলকাতা: মনচাষা, ২০০৫), পৃ. ১৮
৩৪. সুধী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১-২
৩৫. মন্দিরা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
৩৬. *ভারতকোষ*, প্রথম খণ্ড, (আগস্ট আন্দোলন প্রসঙ্গ), (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২১৩; *বাংলা-পিডিয়া*, অষ্টম খণ্ড, (মাতঙ্গিনী হাজরা প্রসঙ্গ), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১১৪; শ্যামাপ্রসাদ বসু, *সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী: মেদিনীপুর ও মানভূম*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩), পৃ. ৫২
৩৭. বিজন ভট্টাচার্য, *নবান্ন* (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯
৩৮. *তদেব*, (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য), পৃ. ৮৪
৩৯. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *তরী হতে তীর*, দ্বিতীয় প্রকাশ, (কলকাতা: মনীষা, ১৯৮৬), পৃ. ৩৬১
৪০. বিজন ভট্টাচার্য, "জনসাধারণের আমি", শিবাদিত্য দাশগুপ্ত সংকলিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫১
৪১. মন্দিরা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
৪২. বিজন ভট্টাচার্য, *জীয়নকন্যা*, (৩য় দৃশ্য), বহুরূপী, সংখ্যা-৩৩, অক্টোবর-১৯৬৯, পৃ. ছাপান্ন
৪৩. সুধী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
৪৪. শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৪৫. বিজন ভট্টাচার্য, *দেবীগর্জন* (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য), প্রথম প্রমা সং., (কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৭৫
৪৬. *তদেব*, (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য), পৃ. ১০১
৪৭. তাপস ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
৪৮. চন্দন খাঁ, *দেবীগর্জন: পুনর্মূল্যায়ন*, (কলকাতা: ঘোষ এন্ড কোং, ২০০৫), পৃ. ৩৮
৪৯. পবিত্র সরকার, *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*, দ্বিতীয় সং., (কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২২৯
৫০. বিজন ভট্টাচার্য, *জননেতা*, গন্ধর্ব, বিজন ভট্টাচার্য ও বাংলার থিয়েটার আন্দোলন সংখ্যা, আশ্বিন-১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৫
৫১. মন্দিরা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

[বি.দ্র.: অন্ত্যটীকা ১৪, ১৫, ১৭, ১৯ এবং ৪২-এ পৃষ্ঠা নম্বর কথায় লেখা হয়েছে। কারণ *বহুরূপী* পত্রিকার ব্যবহৃত এ সংখ্যায় মূল নাটক অংশে পৃষ্ঠা নম্বর কথায় মুদ্রিত এবং প্রবন্ধ অংশে পৃষ্ঠা নম্বর গাণিতিক সংখ্যায় মুদ্রিত। উদাহরণ স্বরূপ: প্রথম পর্ব: নাটক– এক হতে একশত, দ্বিতীয় পর্ব: প্রবন্ধ– ১ হতে ১০০। কাজেই দৃষ্টিকটু হলেও তথ্যবিভ্রান্তি এড়াতে উল্লিখিত অন্ত্যটীকাসমূহের পৃষ্ঠা নম্বর কথায় (যেভাবে লেখা হয়েছে) লিখে মুদ্রণ করাই উচিত।]